তারিখ ... 17 MAY 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ১ ...

যুগান্তর

প্রথমে দমন করুন শিক্ষাঙ্গনের দুর্নীতি

দেশপ্রেমের চশমা

মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া আখতার

বাংলাদেশে দুর্নীতি মহামারীর মতো ছড়িয়ে পড়েছে। সমাজ, রাজনীতি, প্রশাসন ও শিক্ষা— এখন দুর্নীতির ভাইরাসে আক্রান্ত। প্রতিটি সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে আজ শৃংখলা ও সুশাসনের অভাব। পুলিশ, কাস্টমস, ট্যাক্স, ফরেস্ট, সরকারি, আধা সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত অফিস— প্রতিটি প্রতিষ্ঠানেই লেগেছে দুর্নীতির মহামারী। অথচ দুর্নীতির অব্যাহত বৃদ্ধি রোধে কোনো দৃশ্যমান উদ্যোগ নেই। যদিও প্রতিটি বড় রাজনৈতিক দল সংসদ নির্বাচনের আগে দুর্নীতি দমনের জোরালো ওয়াদা করে, প্রতিশ্রুতি দেয় সুশাসন প্রতিষ্ঠার, কিন্তু নির্বাচনে জিতে সরকার গঠনের পর তারা সে প্রতিশ্রুতি ভুলে যায়। তখন ক্ষমতায় টিকে থাকার স্বার্থে সরকার দুর্নীতিবাজদের সঙ্গে আপস করে। দ্বিমুখী নীতি অবলম্বন করে সরকারপন্থী নেতাকর্মীদের দুর্নীতি না দেখার ভান করে বিরোধীদলীয় নেতাকর্মীদের দুর্নীতির প্রতি কঠোর অবস্থান গ্রহণ করে। সরকারপক্ষীয় নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে অপকর্ম ও দুর্নীতির মামলা থাকলে সেসব 'রাজনৈতিক হয়রানিমূলক' মামলা আখ্যা দিয়ে প্রত্যাহার করে বিরোধীদলীয় নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে রুজু করা একই চরিত্রের মামলাগুলোকে সক্রিয় করা হয়। সরকারের এহেন মানসিকতার কারণে দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ করা আর সম্ভব হয় না। তাছাড়া সব ক্ষেত্রের দুর্নীতির প্রতি একইভাবে রক্তচক্ষু নিক্ষেপ না করার কারণেও দুর্নীতিবাজরা দুর্নীতি করতে উৎসাহিত হয়। যেমন— নির্বাচনে দুর্নীতিবাজদের কিছু না বলে রাজনৈতিক স্বার্থ উদ্ধারে এদের ছাড় দিয়ে অন্য ক্ষেত্রের দুর্নীতি দমনে সরকার যে চেষ্টা করে, সে চেষ্টা সফল হয় না।

দলার অপেক্ষা রাখে না, প্রতিটি খাতের দুর্নীতিই ক্ষতিকর। সেজন্য যে কোনো খাতের দুর্নীতিই রোধ করা প্রয়োজন। তবে সব খাতের দুর্নীতির মধ্যে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিকর হল শিক্ষাঙ্গনের দুর্নীতি। আর শিক্ষাঙ্গনের দুর্নীতির মধ্যে সর্বাপেক্ষা ক্ষতিকর হল সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ হিসেবে পরিচিত বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্নীতি। কারণ, যে কোনো মন্ত্রণালয় বা সরকারি অফিসের কর্মকর্তারা; স্বাস্থ্য, আইনশৃংখলা, এনজিও বা অন্য যে কোনো সরকারি ক্যাডারে চাকরিরত কর্মকর্তারা উচ্চশিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে ডিগ্রি অর্জন করার পরই কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। যে শিক্ষার্থী উচ্চ মাধ্যমিক পাস করার পর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়, সে সেখানে জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ৫ থেকে ৬টি বছর কাটিয়ে ডিগ্রি অর্জন করার পর কর্মজীবনে প্রবেশ করে। কাজেই উচ্চশিক্ষাঙ্গনে থাকার সময় যদি সে শৃংখলা, নিয়মানুবর্তিতা, সুশাসন ও স্বচ্ছতার সঙ্গে পরিচিত হয়, তাহলে কর্মজীবনে প্রবেশ করে সে এসব চর্চা করতে পারে। আর যদি সে বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে ছাত্র রাজনীতির নামে দলীয় রাজনীতির লেজুড়বৃত্তি, টেন্ডারবাজি, ফাও খাওয়া, মাস্তানি, চাঁদাবাজি, সময়মতো ক্লাস-পরীক্ষা ও রেজাল্ট না হওয়া, হল দখল, সিট দখল, বন্দুকযুদ্ধ, ক্যাম্পাসে লাশ পড়া, ছাত্রভর্তি ও শিক্ষক নিয়োগে অব্যবস্থাপনাসহ বিভিন্ন অনিয়ম-দুর্নীতির সঙ্গে পরিচিত হয়, তাহলে কর্মজীবনে তার নিজ কাজকর্মে এসবের প্রভাব পড়ে। কাজেই উচ্চশিক্ষাঙ্গনে শাসনের ঘাটতি থাকলে তার প্রভাবে দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়ে সারা দেশে। সে ক্ষেত্রে সরকার যদি প্রকৃতই দুর্নীতি কমাতে চায়, তাহলে সর্বপ্রথম তাকে উচ্চশিক্ষাঙ্গনের দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে মনোযোগী হতে হবে।

দুর্নীতি বলতে কেবল অবৈধ অর্থের লেনদেন বা ঘুষকেই বোঝায় না। ক্ষমতার অপব্যবহার এবং দায়িত্ব পালনে অবহেলাকেও দুর্নীতি হিসেবে গণ্য করা হয়। এসব দিক বিবেচনা করে উচ্চশিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর দিকে তাকালে সেখানে সুশাসনের ব্যাপক ঘাটতি লক্ষ্য করা যায়। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে রাজনৈতিক দলবাজির ব্যাপকতা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, বিরোধীদলীয় মতাদর্শে বিশ্বাসী কোনো শিক্ষক যত বড় স্কলারই হোন না কেন, তাকে কখনোই ভিসি-প্রো-ভিসি নিয়োগ দেয়া হয় না। অন্য সুবিধা প্রদান বা ডেপুটেশনে বড় পদে নিয়োগদানের বেলায়ও এমনটাই হয়। কাজেই বলা যায়, রাজনৈতিক দলবাজি বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক চরিত্র ভূলুণ্ঠিত করেছে। ছাত্র রাজনীতির নামে ছাত্রনেতারা সাধারণ ছাত্রদের স্বার্থকেন্দ্রিক আন্দোলন না করে সাম্প্রতিক সময়ে এ রাজনীতিকে তারা ব্যবসা-বাণিজ্য এবং রাজনৈতিক ক্যারিয়ার গড়ার কাজে ব্যবহার করছে। শিক্ষকদের মাঝেও একাডেমিক চর্চার চেয়ে অনেক ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক চর্চা প্রাধান্য পাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সূচকে এ কারণেই হয়তো এক সময়ের প্রাচ্যের অক্সফোর্ডখ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান হয়েছে হাজার হাজার বিশ্ববিদ্যালয়ের নিচে। অন্যান্য সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান যে আরও খারাপ, তা না বললেও অনুধাবন করা যায়।

একে তো বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে দুর্নীতি, অনিয়ম ও নৈরাজ্য ছড়িয়ে পড়েছে, অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয় দেখভালকারী প্রতিষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গুণগত মান প্রতিষ্ঠায় প্রত্যাশিত ভূমিকা পালন করতে পারছে না। অনেক ক্ষেত্রে ইউজিসি কর্মকর্তারা রক্ষকের পরিবর্তে ভক্ষকের ভূমিকা পালন করছেন। একটি উদাহরণ দেয়া যাক। সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে সাত সদস্যের একটি দল খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে চলমান ৮৬ কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্প কাজ তদারক করতে যায়। এ দলে দু'জন ইউজিসি কর্মকর্তা ও দু'জন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাও ছিলেন। তারা ১০ লাখ টাকা ঘুষ না দিলে চলতি প্রকল্পের ওপর নেতিবাচক প্রতিবেদন তৈরি করে এ খাতে বরাদ্দ ১৬ কোটি টাকা ছাড় না করা এবং ভবিষ্যতে আর কোনো প্রকল্প না দেয়ার হুমকি দেন (যুগান্তর, ০৩-০৫-২০১৬)। ভিসি মহোদয় এ অর্থ না দিয়ে শিক্ষামন্ত্রী ও শিক্ষা সচিবকে প্রথমে ফোন করলে এবং পরে লিখিত অভিযোগ দিলে বিষয়টি ফাঁস হয়ে যায় এবং ওই কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত শুরু হয়। এভাবে মন্ত্রণালয় ও ইউজিসির কর্মকর্তারা যদি দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে রক্ষকের পরিবর্তে ভক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন, তাহলে শিক্ষা ক্ষেত্রে দুর্নীতি রোধ করা কঠিন হয়ে পড়বে।

২০২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষ পূর্তি পালনের প্রাক্কালে এ বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কার করে এর হারানো একাডেমিক ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। এরই অংশ হিসেবে সম্প্রতি ঢাকার একটি প্রকাশনা সংস্থা ইমতিয়াজ আহমেদ ও ইফতেখার ইকবাল সম্পাদিত 'The University of Dhaka Making Unmaking Remaking' শীর্ষক ইংরেজি ভাষায় সুদৃশ্য একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেছে। এ গ্রন্থে একাডেমিশিয়ানরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যা, সংস্কার ও সম্ভাবনা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সুপারিশ প্রদান করেছেন। 'Governance, Politics and Higher Education' শীর্ষক এ গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ে আমার লেখা একটি প্রবন্ধ রয়েছে। 'Transparency in Tertiary Education: Politics, Admission and Recruitment' শীর্ষক এ প্রবন্ধে আমি তথ্য-উপাত্তের মাধ্যমে সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে কীভাবে দুর্নীতির চর্চা করা হচ্ছে তা উপস্থাপন করেছি। কীভাবে দলীয় রাজনীতির ব্যাপকতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক চরিত্রকে কলুষিত করছে সে বিষয় তুলে ধরেছি। কীভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো প্রতিষ্ঠানে নিয়োগের ক্ষেত্রে আর্থিক দুর্নীতি হচ্ছে সে বিষয়টিও দৃষ্টান্ত সহকারে উপস্থাপন করেছি। আরও দেখিয়েছি, বড় সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ১৯৭৩ সালের অধ্যাদেশ অনুযায়ী পরিচালিত না হয়ে কীভাবে পদে পদে এ অধ্যাদেশ লংঘন করছে। ছাত্রভর্তি, শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগে স্বচ্ছতার অভাব এবং অবৈধ আর্থিক লেনদেনের অভিযোগও ওই লেখায় প্রকাশিত হয়েছে। উল্লেখ্য, স্বাধীনতার পর থেকে ১৬ বার সংবিধান সংশোধন করা সম্ভব হলেও ১৯৭৩-এর সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ অকার্যকর জেনেও এ অধ্যাদেশ যুগোপযোগী করার কোনো উদ্যোগ নেয়া হয়নি।

বিভিন্ন সময় গৃহীত সরকারের দুর্নীতি দমনের উদ্যোগ পরীক্ষা করে মনে হয়, এসব দুর্নীতি দমন অভিযান চালানো হয় রাজনীতি দমন বা রাজনৈতিক বিরোধিতা দমনের উদ্দেশ্যে। এ কারণেই এক-এগারোর পর ফখরুদ্দীন সরকার গৃহীত দুর্নীতি দমন অভিযান ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেও ব্যর্থ হয়েছিল। বাংলাদেশের বর্তমান দুর্নীতি পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে বলা যায়, এমন কোনো এলাকা বা সরকারি-বেসরকারি খাত নেই যেখানে দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়েনি। ফলে সরকার যদি প্রকৃতই দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ করতে চায় তাহলে বলতে হবে, একসঙ্গে এ বিশাল ক্ষেত্রের দুর্নীতি দমন করার মতো লোকবল সরকারের নেই। কাজেই দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণের ইচ্ছা থাকলে সরকারের উচিত হবে একসঙ্গে সব ক্ষেত্রের দুর্নীতি দমনে কাজ না করে নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কোনো বিশেষ ক্ষেত্র চিহ্নিত করে ওই এলাকার দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে মনোযোগ দেয়া। এভাবে ওই বিশেষ ক্ষেত্রের দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ করে তারপর আরেকটি ক্ষেত্র চিহ্নিত করে দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ করা। এভাবে সময় নিয়ে পর্যায়ক্রমে সারা দেশের দুর্নীতি কমিয়ে ফেলা। এমনটি না করে সরকার যদি একসঙ্গে সারা দেশের দুর্নীতি দমনের উদ্যোগ নেয়, তাহলে সে প্রচেষ্টা সফল হবে না। এসব জেনেও সব সরকারই নির্বাচনের প্রাক্কালে ভোটারদের সমর্থন পাওয়ার জন্য স্বল্প লোকবল নিয়ে সারা দেশের দুর্নীতি দমনের উদ্যোগ গ্রহণের ঘোষণা দেয়। সরকার যদি অগ্রাধিকার বিবেচনা করে দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ায় একেকটি ক্ষেত্রে দুর্নীতি দমনের নীতি গ্রহণ করে, তাহলে নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে আমি সরকারকে সর্বপ্রথম শিক্ষাঙ্গনের দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে মনোযোগী হতে বলব। কারণ, শিক্ষাঙ্গনের দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ করে এ ক্ষেত্রে শৃংখলা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা গেলে সারা দেশের দুর্নীতি পরিস্থিতির ওপর এর একটা ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। আগেই বলেছি, দেশের সব মন্ত্রণালয়, বিভাগ, প্রশাসনিক স্তর ও অফিস-আদালতে কর্মরত সব কর্মকর্তা যেহেতু উচ্চশিক্ষাঙ্গন থেকে ডিগ্রি অর্জনের পর কর্মক্ষেত্রে যোগ দেন, সেহেতু উচ্চশিক্ষাঙ্গনে সুশাসন দেখে এলে তারা কর্মজীবনেও এর চর্চায় উদ্বুদ্ধ হবেন। এ কারণে আমার পরামর্শ, একসঙ্গে সব ক্ষেত্র থেকে দুর্নীতি দমনে মনোযোগ না দিয়ে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে প্রথমে উচ্চশিক্ষাঙ্গনের দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে জোরালো উদ্যোগ গ্রহণ করা হোক। কারণ, অন্যান্য ক্ষেত্রের দুর্নীতির চেয়ে শিক্ষাঙ্গনে বিরাজমান দুর্নীতি অনেক বেশি ক্ষতিকর।

ড. মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া আখতার : *অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান, রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়*
akhtermy@gmail.com